IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

‘পঞ্চতপা’ উপন্যাসে আদিবাসী জীবন ও নগরকেন্দ্রিক সভ্যতা : ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

[Tribal Life & Urban Civilization In The Novel 'Panchatpa': Novelist Ashutosh Mukhopadhyaya]

পায়েল হালদার

গবেষক, বাংলা বিভাগ, বিশ্বভারতী

Abstract: In Indian literature as well as in Bengali literature, the position of tribal society can be observed from the era of the Charyapada. Novelist Ashutosh Mukhopadhyay, who started writing from the fifties, has also written about that ancient tribal society in several novels. Throughout his novel 'Panchatpa' there is a various picture of tribal life. There are hills in two sides of Marai river. Many villages of tribal Santals are at the foot of those hills. The main plot of the novel starts from this place. The novelist has started weaving the novel by putting the modernity of the civilized society in front of the ancient uneducated tribal people in this region on the banks of Marai. As a result, various reactions of the tribal society and the history of their life are found. And from this history it is known about the struggle for the survival of that primitive civilization till today. In the novel 'Panchatpa' on one side there is a struggle for existence and on the other side there is how a new civilized society has arisen based on the existence of those early humans. The road to new urbanization is widening.

Keywords: **উপন্যাস** (Novel), ঔপন্যাসিক (Novelist) , মনস্তত্ব (Psychology), নগরায়ন (Urbanization), আদিবাসী জীবন (Tribal life), নগর জীবন (Civilized Society), শ্রেণি বৈষম্য (Class Discrimination), বহুগামিতা (Libido), সম্পর্ক (Relationship), উচ্চবিত্ত সমাজ (Upper class), মধ্যবিত্ত সমাজ (Middle class).

সাহিত্য পর্যালোচনা (Literature Review): মাঘ, ১৪০০ বঙ্গাব্দ (১৯৯৪ খ্রি.) থেকে ১ বৈশাখ, ১৪২৯ বঙ্গাব্দ (২০২২ খ্রি.) পর্যন্ত দীর্ঘ আঠাশ বছর ধরে সাহিত্যিক কন্যা শ্রীমতী সর্বাণী মুখোপাধ্যায় ও প্রখ্যাত ‘মিত্র ও ঘোষ’ প্রকাশনার যৌথ উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলীর ছাব্বিশটি খণ্ড। ছাব্বিশতম খণ্ডটিতেই ঔপন্যাসিকের প্রতি ‘শেষ সমাপ্তি-তর্পণ’ করেছেন আশুতোষ তনয়া। সুতরাং পাঠক সমীপে **এই** সাহিত্যিক সত্তার সুবিশাল কর্মযজ্ঞের অবসানকে সুনিশ্চিত করা যেতে পারে ২০২২ সালে। আশুতোষ রচনাবলীর ছাব্বিশটি খণ্ডের

প্রতিটিতে একত্রিত করে উপস্থাপিত করা হয়েছে তাঁর জীবিতকাল ও মৃত্যুর পরেও ‘মিত্র ও ঘোষ’ এবং অন্যান্য প্রকাশনা কর্তৃক পুস্তক আকারে প্রকাশিত উপন্যাস, গল্পগ্রন্থ বা গল্প সংকলন। তবে শুধুমাত্র প্রকাশিত উপন্যাসই নয় অপ্রকাশিত কিছু নতুন উপন্যাসও রচনাবলীতে স্থান পেয়েছে। তাঁর জীবিতকালে নানা পত্র-পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত উপন্যাসগুলিরও সন্ধান মিলেছে সেখানে। তবে ঔপন্যাসিক আশুতোষ তাঁর একেবারে প্রথম জীবনে লেখা চারখানি উপন্যাস -‘কালচক্র’, ‘আর্তমানব’, ‘জীবনতৃষ্ণা’ ও ‘উল্কা’-কে তাঁর উপন্যাসের পরিসর থেকে বাতিল করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই কারণেই সূচনালগ্নের এই উপন্যাসগুলিকে রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। রচনাবলীর অন্তর্গত বাইশটি খণ্ডে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা উনআশিটি এবং **৩য়,** ৪র্থ, ৭ম ও ৮ম মোট চারটি খণ্ডে প্রকাশিত পঁচিশটি গল্পগ্রন্থের অন্তর্গত গল্পের সংখ্যা একশ ছিয়াত্তরটি। ইতিপূর্বে ‘আনন্দবাজার’, ‘বর্তমান’, ‘যুগশঙ্খ, ‘দেশ’ **’,**‘বার্তা টুডে’**,** ‘যুগশঙ্খ’**,** ‘প্রথম আলো’ ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য-কর্ম নিয়ে পাঠ-প্রতিক্রিয়ামূলক সমালোচনা বা সামান্য কিছু স্মৃতিকথার সন্ধান মেলে ঠিকই**,** কিন্তু তাঁকে নিয়ে সামগ্রিক গবেষণাকর্ম বিশেষরূপে পরিলক্ষিত হয়নি।

চল্লিশের দশক থেকে সাহিত্যিক হয়ে ওঠার যাত্রা শুরু হলেও পঞ্চাশের দশকটিকেই আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যিক জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রথম পর্যায় ধরা যেতে পারে। পপঞ্চাশের দশকের একেবারে শেষভাগে ১৯৫৮ তে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস ‘পঞ্চতপা’ প্রকাশিত হয় মাসিক বসুমতী পত্রিকায়। ১৯৫১ থেকে ১৯৫৮ পর্যন্ত সময়কালে তিনি আর একটি মাত্র উপন্যাস লিখেছিলেন যার নাম ‘জীবনতৃষ্ণা’। এইটি বাদে এই সাত বছরের কালপর্বে আর কোনো উপন্যাস তিনি লেখেননি। এই সময় তিনি শুধু সাহিত্য চর্চা করেছেন এবং জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পথে ব্রতী হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন বহু স্থান। আর ঘুরতে ঘুরতেই দেখেছেন মানব সভ্যতার ইতিবৃত্ত, নগরায়ন, চিনে নিয়েছেন ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রতীক দ্রাবিড় কৃষ্ণকায় মানুষগুলির যাপনচিত্র। আর দেখেছেন মানুষের হাতে প্রকৃতির একটু একটু করে বদলে যাওয়া। এই সকল দেখা ও উপলব্ধির পরিসরেই ‘পঞ্চতপা’ উপন্যাসের প্লট বুনন শুরু করেন ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই উপন্যাসের কাঠামো তৈরি হয়েছে মড়াই নদীর উপর বাঁধ নির্মাণকে কেন্দ্র করে। এই বাঁধ নির্মাণের বিশাল কর্মকাণ্ডকে ঘিরেই মূল চরিত্র গুলির অবতারণা। উপন্যাসটির মূল কাহিনি থেকে নদীর মতোই একাধিক উপকাহিনির উপস্থাপনা করা হয়েছে। আর সেই সকল উপকাহিনি সহযোগে মূল আখ্যানকে অবলম্বন করেই উপন্যাসটির বিষয়বৈচিত্র্যময়তা উপলব্ধি করা যায়। বিষয়গুলি নিম্নরূপ –

- ***আদিবাসী সমাজ:*** বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের যুগ থেকেই আদিবাসী সমাজের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। সেই একইরকম অবস্থানকে দেখা যায় ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের একাধিক উপন্যাসেও। সমগ্র ‘পঞ্চতপা’ উপন্যাস জুড়েই রয়েছে আদিবাসি জীবনের যাবনচিত্র। মড়াই নদীর এপার ওপার দুপারে পাহাড়। আর সেই পাহাড়ের কোলেই আদিবাসী সাঁওতালদের কতগুলি গ্রাম। উপন্যাসের মূল কাহিনির বিস্তার শুরু হয় এই স্থানকে কেন্দ্র করেই। মড়াই এর তীরবর্তী এই অঞ্চলেই সভ্য সমাজের আধুনিকতাকে পৃথিবীর প্রাচীন অশিক্ষিত আদিবাসী মানুষগুলির সামনে দাঁড় করিয়ে কাহিনির বুনন শুরু করেছেন ঔপন্যাসিক। ফলে পাওয়া যাচ্ছে আদিবাসী সমাজের নানাবিধ প্রতিক্রিয়া ও তাদের জীবনচিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ। যে আদিবাসী সমাজের কথা ঔপন্যাসিক তাঁর সমসাময়িক সময়ে বলছেন তারা ভারতবর্ষের সর্বপ্রাচীন প্রজন্ম দ্রাবিড়িয়ান বংশদ্ভুত। আর্য সমাজের আগমনের পর থেকে কয়েক হাজার যুগ ধরে তারা অত্যাচারিত নিপীড়িত হয়ে এসেছে। শোষন নিপীড়ন করে তাদেরকে ভিত্তি স্তম্ভ হিসাবে দাঁড় করিয়েই আধুনিক উন্নত সভ্য সমাজের নগরায়ন গড়ে ওঠে। অথচ তারাই অবহেলিত, অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত। তাই মাঝে মাঝেই অন্যায়ের উচিত প্রতিবাদ হিসাবে কিংবা কখনো প্রতিহিংসাপরায়ণতা থেকে সভ্য সমাজের প্রতি বিরূপ হয়েও তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। যদিও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা হেরে যায়। তবু পৃথিবীর বুক থেকে তারা নিশ্চিহ্ন হওয়ার নয়। তারা লড়ে বাঁচতে শিখেছে এবং তথাকথিত সভ্যতাও তাদের কায়িক শ্রম ছাড়া চলবে না। তাই তাদের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আধুনিক সভ্যতার গতিও নেই –***‘বিদ্রোহী ভৃগুর পায়ের চিহ্ন ভগবানের বুক থেকে মুছবে কোনো দিন? সভ্যতার বুক থেকে এই বিদ্রোহী কালো মানুষদের পায়ের দাগও মিলাবে না কোনো দিন’***[১]।

পঞ্চতপা উপন্যাসের কাহিনি নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক এই আদিবাসী সমাজকে ভিত্তি হিসাবে স্থাপন করেছেন। তারপর তাদের কর্মযজ্ঞে ঝাপিয়ে পরে মড়াই নদীকে বাঁধার কীর্তি নিয়েই এগিয়ে চলে উপন্যাসের কাহিনি। ঔপন্যাসিক উপলব্ধি করেছিলেন –' *অন্ধ-বিশ্বাসীর বুকে বিপ্লবের আগুন জ্বালতে হলে এই বজ্রনির্ঘোষ ছাড়া আর গতি ছিল না কিছু। প্রাণ দিয়েছে সেই 'মারাং বুরু' প্রতীক সিদু কাহ্নুও'*[২]। মঙ্গল যজ্ঞে নিজেদের প্রাণের আহুতি কী করে দেয় আদি মানবেরা সেই চিত্রই ঔপন্যাসিক দেখাতে চেয়েছেন তাঁর এই উপন্যাসের। ফলে উপন্যাসে পাওয়া গেছে সেই আদি মানবদের সমাজের কথা। জানা গেছে আদিবাসি গ্রামের *'মাঝি', 'পারণিকদের'*[৩] কথা, তাদের সমাজের *'ভদ্রলোক এবং আধা-ভদ্রলোকদের'*[৪] কথা, *'জগমাঝির'*[৫] কথা। মড়াইয়ের আদিবাসি সমাজের 'মাঝি' ও 'পারণিকেরা' ছিল গ্রামের মোড়ল তথা হর্তা-কর্তা স্তরের মানুষ, সেই সমাজের 'ভদ্রলোক এবং আধা-ভদ্রলোক' অর্থে তাদের প্রতি ঔপন্যাসিক ইঙ্গিত করেছে যাদের শরীরে আদিবাসী রক্ত বইলেও যারা খানিকটা শিক্ষার আলোকে এসেছে বা তখনো আসার চেষ্টা করছে। আর এই সমাজের 'জগমাঝির' পদ যারা পেত তাদের দায়িত্ব বর্তাত তাদের সমাজের যুবক যুবতীদের মাঝে যেন কখনো কোনো অবাঞ্ছিত সম্পর্কের ঘটনা না ঘটে সেই বিষয়ের উপর। আর যদি তা ঘটে তাহলে সেই নারী পুরুষকে *'বিটলা'*[৬] অর্থাৎ সমাজচ্যুত করা হত। আবার জানতে পারা যায় তাদের সম্প্রদায়ের *'বাদনা উৎসব'*[৭] সম্পর্কেও। তাদের পীঠস্থানের ঈশ্বরের নাম *'জাহের এরা'*[৮]। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের কামনায় আদিবাসীরা 'জাহের এরার' পূজো করে। চারদিনের উৎসবে মহুয়ার নেশায় মাতাল হয়ে নাচ গান আর ভোজে মেতে থাকে। তাদের *'ডাংরা'*[৯] (গরু) নিয়ে নাচে মেতে ওঠার আসুরিক রীতিটিও ঔপন্যাসিক নিঁখুত ভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন তার উপন্যাসের কাহিনির পরিসরে। তাদের সমাজের নারী পুরুষেরা একই সাথে একই রকম দিন মজুরের কাজ করে। সেখানে নারী পুরুষের সামাজিক কোনো ভেদাভেদের স্থান নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় পঞ্চতপা উপন্যাসে আদিবাসী সমজের সূক্ষাতিসূক্ষ বিষয়গুলিকে কাহিনি নির্মাণের পরসরে ব্যবহার করেছেন।

- ***আদিবাসি জীবনের সঙ্গে তথাকথিত সভ্যতার ব্যবধান:*** উপন্যাসের শুরুতেই মড়াই-এ বাঁধ দেওয়ার মতো বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড প্রসঙ্গে সরল সাধারণ অশিক্ষিত, বিজ্ঞান না চেনা আদিবাসি মানুষদের হয়ে তাদের ভাষাতেই সাওয়াল তুলেছেন সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় – *'নিগড় দিবি? ওই মড়াইয়ের পায়ে? কিন্তু মড়াই তো মরেই আছে। ধারা কই? কাকে আটকাবি? কাকে বাঁধবি? জল পাবি কোথা? তোরা কি পাগল? তোরা দস্যু?'* [১০] আসলে এই সকল আদিবাসি কৃষ্ণকায় সাওতাল মানুষেরা সভ্যতার আলোকের স্পর্শ পায়নি। তাদের কাছে নদীতে বাঁধ দিয়ে জল ধরে রাখা আবার খড়ার সময় বাঁধের দরজা খুলে দিয়ে সেই জল পাওয়ার এই বিপুল কর্মযজ্ঞ ছিল বিস্ময়কর, স্বপ্নের মতো অবিশ্বাস্য। তারা সভ্যতাকে সন্দেহের চোখে দেখে। তারা *'সিধু কান্হুর'*[১১] পরবর্তী প্রজন্ম। তারা সভ্যতার কড়াল মূর্তি দেখেছে, যুগের পর যুগ ধরে নিপিড়িত হয়ে এসেছে। তাই তারা প্রতি পদক্ষেপে ঠকে যাওয়ার ভয় পায়। কোনো এক সকালে তাদের মুখ চেয়ে সভ্য জগতের কেউ মড়াই এ বাঁধ দিয়ে কোনো স্বার্থ ছাড়াই অকারণে তাদের উপকার করার পরিকল্পনা নিয়ে আসবে এমন বিশ্বাস করা তাদের পক্ষে শক্ত ব্যাপার। তারা তা বিশ্বাস করতে পারেনি। ডিনামাইট ব্লাস্ট করে পাহাড় গুরিয়ে দিয়ে পাথর সঞ্চয় করে যখন নদীর বাঁধ তৈরি হওয়ার কথা যখন তারা জেনেছে তখন তারা শিউরে উঠেছে। সরকার থেকে যে তাদের পাহাড়ের বিপদসঙ্কুল লাল দাগেতে পরে যাওয়া ভিটা মাটি ছেড়ে অন্যত্র সরে যাওয়ার নোটিস দেওয়া হয়েছিল তাতে তারা ক্ষিপ্ত হয়েছে। অন্যত্র বাসস্থান গড়তে অর্থ সাহায্যের আশ্বাস বা মড়াইয়ের ড্যামে বেতন ভিত্তিক তাদের কাজ পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস কিছুই তাদের বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়নি। তারা আরো বেশি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে সভ্য সমাজের মানুষদের বিপরীতে। মড়াইয়ের ড্যাম তৈরির প্রধান কর্তা চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির অধিনস্ত ইঞ্জিনিয়ার ড্রাফটম্যান নরেন চৌধুরী, ওভারসিয়ার অবনীবাবুর দিকে তীর ধনু নিয়ে চড়াও পর্যন্ত হয়েছিল তারা। এই উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ দুই গুরুত্বপূর্ণ আদিবাসী চরিত্র পাগল সর্দার ও তার শিষ্যতুল্য হপুন। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের সত্যতাকে উপলব্ধি করেছিল পাগল সর্দার। পাগল সর্দার যেন আদিবাসী জীবন এবং সভ্যতার মাঝে বোঝাপড়ার সেতু। বাঁধ নির্মাণের কাজে সেইই প্রথম সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল সভ্য সমাজের দিকে। নিজের জাতিকে বোঝাতে চেয়েছিল এতে আসলে তাদেরই ভালো। তারা কাজ পাবে, ক্ষতিপূরণ পাবে আর সর্বোপরি পাবে মড়াই এর জল। *'... মরেছে বলেই তো মড়াই'। ...ঘরে সকলকে মারছে বলেই তো মড়াই। কলসীর জলে মরুভূমির 'তেষ্টা' মেটে? বর্ষা না ফুরোতেই মাটির আগুন টেনে নেয় সব বর্ষা'*[১২]। এ হেন মড়াই এর জলকে ধরে রেখে অকালে তাদের দুর্বিসহ জীবনে জলের তেষ্টা মিটবে এই বিশাল কর্মযজ্ঞের ফলে। তাতে সাহায্য না করে উপায়ও যে নেই কারণ সরকারি পরোয়ানার কাছে আদিবাসীদের তীরের ফলা যে অবশেষে টিকবে না এবং অযৌক্তিক বিদ্রোহের জেরে ডিনামাইটের আঘাতে ভয়ানক পরিণতি পাবে পাহাড়ের কোলে থাকা আদিবাসীদের গ্রামগুলি তা বুঝে নিয়েছিল পাগল সর্দার। বোঝাতে চেয়েছিল নিজের সমাজকে। কিন্তু একাজ করতে গিয়ে সে

প্রথমদিকে নিজের সমাজের কাছেই যেন ঘরশত্রু হিসাবে চিহ্নিত হয়। বারেবারে আক্রমণের তীর তার দিকে এগিয়ে এলেও যেন বীর বিক্রমে বুক চিতিয়ে আক্রমণকে সে প্রতিহত করেছে। নিজের সমাজের হাত থেকে রক্ষাও করেছে কর্মযজ্ঞের কাণ্ডারীদের। অবশেষে যখন আদিবাসী সমাজও ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছে যে এই মহাকর্মযজ্ঞের সহযোগী হওয়া ছাড়া তাদের দ্বিতীয় কোনো উপায় নেই তখন আবার এই পাগল সর্দারের শরণাপন্ন হয়েই তারা একে একে প্রত্যেকেই নাম লিখিয়েছে মড়াইয়ের ড্যাম তৈরির কাজে। কিন্তু তবুও তথাকথিত সভ্যতার সঙ্গে সহজ সরল আদিবাসী জীবনের মানসিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের শেষ নেই। আসলে তথাকতিত রূপে সভ্য শহুরে সমাজের উচ্চবিত্ত মানুষদের সঙ্গে কাজের সুবাদে ওঠাবসা হলেও দূরত্ব একটা থেকে যায়। সে দুরত্ব পদমর্যাদার, আত্মগরিমার। ড্রাফটম্যান নরেন চৌধুরী বা চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির কাজের শুরুতে আদিবাসীদের বোঝানো বা তাদের বাগে আনার জন্য যেভাবে পাগল সর্দারকে গুরুত্ব দিয়েছিল কার্যসিদ্ধির পর সেই গুরুত্ব কমতে থাকে। নিজ নিজ পদমর্যার গর্বে তারা পাগল সর্দারের থেকে যথোপযুক্ত ব্যবধান রেখে আবার চলতে থাকে। এই ব্যবধান যে পাগল সর্দার অনুভব করতে পারেনি তা নয় –***‘কিন্তু সদ্য বর্তমানে নিজের অগোচরে এই পাগল সর্দারের মনেই একটুখানি খেদ আছে বোঝা যায়। এখন রাস্তা হয়েছে কোয়ার্টার হয়েছে, আপিসঘর হয়েছে, জিপ ট্রাক এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধানও এসেছে খানিকটা। বর্তমানের এই আপিস-আবহাওয়াটাই সর্দারের পছন্দ নয়। পাহাড়ের-পাথরে, জলে-জঙ্গলে বিঘ্ন উত্তরণের একাত্মায় মড়াইয়ের নায়ক ছিল তাদেরই একজন। কিন্তু সে আডভেঞ্চারের নায়ক আজ অফিসের বড় সাহেব’***[১৩]**।** সরল আদিবাসী মানুষেরা প্রাতিষ্ঠানিকতা বোঝে না। জটিলতা বোঝে না। পাগল সর্দার মড়াইয়ের বিশাল কর্মযজ্ঞের নায়ক হিসাবেই গ্রহণ করেছিল চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলিকে। কাজের সুবাদে মেলামেশায় তাকে নিকটজন হিসাবে ধরে নিয়েছিল। পদমর্যাদার গাম্ভীর্য, ব্যবধান এসব বিষয় তার বোধের বাইরে। সরল জীবনকে এভাবে ধীরে ধীরে বদলে যেতে দেখা তার পক্ষে সুখকর ছিল না। এই ব্যবধান আরো বেশি অনুভূত হয় মড়াই-এ বাঁধ নির্মাণের সাইটে আকস্মিক অঘটনগুলি ঘটতে থাকার সময়। মড়াই এর বাঁধ নির্মাণের সাইটে প্রায়সই ঘটে অঘটন, সেখানে কাজ করা ঝুঁকিপূর্ণ জেনেও আদিবাসীরা তা করে। তাদের প্রাণ যেন মহাযজ্ঞের আহুতিতুল্য। কিন্তু সে আহুতিতে কিছু এসে যায় না ***‘কলের মানুষ’*** [১৪] চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির। তিনি শোক তাপের গণ্ডী পেরিয়ে যান্ত্রিকভাবে কাজ করে চলেছেন এবং বাকিদের কাছেও সেই প্রত্যাশাই রাখেন। কোনো শোকপালনের অবসর তিনি দিতে চান না। এমনকি পাগল সর্দারের সন্তানতুল্য হপুন, যে কিনা বারংবার নিজের সমাজের সামনে রুখে দাঁড়িয়ে মড়াই এর কাজকে ত্বরান্বিত রাখতে সহযোগী ছিল তার আকস্মিক মৃত্যুতেও বাদল গাঙ্গুলির বিশেষ কিছু এসে যায় না। মড়াই এর কাজকে দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই যেন তার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। তার মাঝে যেন মৃত্যু শোক তাপ ঝড় ঝঞ্ঝা কোনো কিছুরই বাধা সৃষ্টি করার অনুমতি নেই। ‘রক্তকরবীর’ রাজার মতো যান্ত্রিক তিনি, ‘কলের মানুষ’। তিনি বলেন –***‘ওই লোকটার মত যদি আজ আমিও অমনি থেমে যাই, একবারও চাইব না সকলে মিলে আমায় নিয়ে একটা শোকের দেওয়াল গড়ে তুলুক।... গাছটা হাতে করে সরিয়ে দিলাম, কিন্তু শোকটাকে তো আর হাতে করে সরিয়ে ফেলা যায় না – যায় কাজে ডুবে থাকা’***[১৫]**।** কিন্তু এইসব কথা নিয়ে বিবেচনার বোধ নেই আদিবাসীদের। তারা বিশ্বাস রাখে যান্ত্রিকতায় নয় আত্মিকতায়, ভালোবাসায়। শোক তাপ সকল অনুভূতিই তাদেরকে স্পর্শ করে। তারা আকস্মিক উত্তেজিনায় থেমে যায়, অঘটনকে ভবিতব্য বলে মেনে নিয়ে সহজ হতে শক্ত হতে তাদের সময়ের প্রয়োজন হয়। এই ব্যাবধান শুধু আদিবাসী সমাজের সাথে তথাকথিত শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সভ্য সমাজের নয় এই ব্যবধান যান্ত্রিকতা বনাম মানবিকতারও।

- ***উচ্চবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের অবস্থানগত সংঘাত:*** পঞ্চতপা উপন্যাসের বিষয়বৈচিত্র্যের মধ্যে অন্যতম আরো একটি বিষয় হল নগরজীবনের অন্তর্গত উচ্চবিত্ত শ্রেণি ও নিম্ন মধ্যবিত্তের অবস্থানগত সংঘাত। উপন্যাসটিতে একাধিক উপকাহিনি রয়েছে। তাদের মধ্যে একটি উপকাহিনির অবতারনা হয়েছে মড়াইয়ের বাঁধ নির্মাণ কর্মকাণ্ডের মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির ব্যক্তিগত জীবনকে কেন্দ্র করে। আর সেখানেই এই সংঘাতের বিষয়টি লক্ষণীয়।

অধ্যাপক অতনু শাশমল তাঁর ‘বাংলা উপন্যাস ও গল্পে নগরজীবন’ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে বলেছেন- ***‘গ্রামীণ সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার পটে নগরকেন্দ্রিক ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ‘বুর্জোয়া’ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ঘটল। মধ্যযুগ এবং নতুন আধুনিক যুগের এমন ক্রান্তিলগ্নে নবোদ্ভূত নগরের অন্যতম অবদান হল মধ্যবিত্ত শ্রেণী। ঐতিহাসিক এ. এফ পোলার্ড বলেছেন, ‘...Where you had no middle class, you had no Renaissance and no Reformation.’***[১৬] অর্থাৎ মধ্যবিত্ত শ্রেণির অবদান না

থাকলে সমাজের কোনোরূপ সংস্কার সম্ভব নয়। কিন্তু সেকথা বুঝতে চায় না উচ্চবিত্ত ধনতান্ত্রিক সভ্যতার কাণ্ডারীরা। উপন্যাসের অন্তর্গত বাদল গাঙ্গুলির জীবনকেন্দ্রিক উপকাহিনিটিতে রয়েছে পাঁচটি চরিত্র – বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার নেশন বিলডার্স লিমিটেডে পদস্থ কর্মচারী বাদল গাঙ্গুলি, তার প্রেমিকা নীলা, নীলার পিতা তথা নেশন বিলডার্সের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বিপুল বাগরী, তার স্ত্রী এবং বাদলের সহকর্মী নরেন চৌধুরী এবং বাদলের মা। এখানে ধনতান্ত্রিক শ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে তিনটি চরিত্র বাগরী দম্পতি ও তাদের সন্তান নীলা। অন্যদিকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেছে বাদল গাঙ্গুলি। ম্যানেজিং ডীরেক্টোর বিপুল বাগড়ি মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙুলিরে বিদেশে পড়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তারপর পাকা ব্যবসায়ীর মতো আসল ও সুদ উসুলের ছক কষেই বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার বাদলকে নিজের কম্পানিতে চাকরি দিয়ে অধিনস্ত করে করে রাখতে চেয়েছিলেন। একমাত্র কন্যা নীলা এবং বাদলের প্রেমের সম্পর্ক নিয়েও অসুবিধার কারণ ছিল না বাগড়ী দম্পতির কারণ তাঁরা তাদের উপকারের গণ্ডীতে আবন্ধ করে মধ্যবিত্ত ছেলেটিকে ঘরজামাই করে কিনেই রাখতে চেয়েছিলেন প্রায়। শুধু নীলাকে ভালোবাসার কারণে নীলার মায়ের একাধিক অপমান কটূক্তিকেও হাসিমুখেই উড়িয়ে দিত বাদল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে এই বিবেকহীন বুর্জোয়াতন্ত্রের বিরূদ্ধাচারণ করতে বাধ্য হল। নেশন বিল্ডার্সের কন্ট্রাক্ট পাওয়া সাততলা ম্যানশন তৈরির কাজের ডিজাইন তৈরি করেছিলেন ডিরেক্টর বিপুল বাগড়ি নিজেই। কিন্তু সেই ডিজাইন অনুযায়ী ম্যানশন বানানোর আগে জমির প্রস্তুতি আছে কিনা তা বুঝে নেওয়ার জন্য আগেই শতর্ক করেছিল বাদল। তার মতামত অনুযায়ী সয়েল টেস্টের অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। অথছ বিপুল বাগড়ি তার দাম্ভিকতার বশে তা করতে দেননি। কিন্তু অবশেষে যখন সত্যিই বোঝা গেল যে বাদলের অনুমানই ঠিক ছিল এবং নেশন বিল্ডার্স সেই সাততালা বিল্ডিং এর কন্সট্রাকশন থামিয়ে দিতে বাধ্য হল তখন বিপুল বাবু নিজের দোষ ঢাকতে অপমান পূর্বক বাদলকেই কাঠগরায় দাঁড় করালেন। তাকেই এই লোকসানের দোষ মাথা পেতে নিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু বাদল এবার আর এতবড় আঘাত মেনে নিতে চায়নি, সে তার অধ্যাবসায়ের অপমান মেনে নিতে চায়নি। উলটে সে এই ঘটনার দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছিল। এই অপমান মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না বাদলের পক্ষে। তাকে কড়া পথে দমাতে না পেরে আবেগি ভাষায় বোঝাতে এল ধনতান্ত্রিক সমাজের আরো এক প্রতিনিধি তারই প্রেমিকা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টারের মেয়ে নীলা। সে চেয়েছিল তার পিতার উপকারের দোহাই দিয়ে বাদলকে বাগে আনতে। তা না পারায় দাম্ভিকতার সাথে বেরিয়ে এল নীলারও বিকারগ্রস্ত চেহারা –***'...ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে কাব্য করলেই তো পার। তুম কি ভাবো এ পর্যন্ত তোমায় টেনে তোলা হয়েছে তোমার ভাবের ঘোরে বৈরাগী হবো বলে?'*** [১৭] বাবার বিরুদ্ধে বাদলকে দমানর শেষ চেষ্টা স্বরূপ সম্পর্ক ভাঙার হুমকি পর্যন্ত দিল সে। কিন্তু এত অপমানের পর আর বাদলের মনে তার সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব থাকল না। বিকারগ্রস্ত বুর্জোয়াতন্ত্রের অপমান অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে তার ভালোবাসার কুরবানী দিতে আর দ্বিধা বোধ করল না। কিন্তু উপকারীর উপকার স্বীকার করে ঋণমুক্ত হতে একদিকে সে যেমন নেশন বিল্ডার্স কর্তৃপক্ষের কাছে ভুলে দায় স্বীকার করে বিপুল বাগড়িকে অব্যহতি দিল অন্যদিকে তাদের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে ধনতন্ত্রের দাসত্ব থেকে নিজে মুক্তি লাভ করল। কিন্তু এই ধনতন্ত্র মধ্যবিত্তের সংঘাতে জন্ম হল বাদলের নতুন এক যান্ত্রিক জীবনে। জীবনের সারল্য ভুলে আনন্দ ভুলে সে এবার বড় কিছু করে দেখিয়ে নিজেকে সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে প্রমাণ করতে চায়। অপমানের জবাব দিতে চায়। আর সেই জবাবের দেওয়ার মহড়া সে শুরু করে মড়াইয়ের বাঁধ দেওয়ার বিপুল কর্মযজ্ঞের মধ্যে দিয়ে –***'এত বড় কাজের মধ্য দিয়ে জীবনের এক ব্যর্থ অপমানকে পেরিয়ে চলছিল বাদল গাঙ্গুলি'***[১৮]। মড়াইয়ের জগতে সে শুধু বোঝে কাজ, সজীবতাহীন পাথরের মতো কঠিন 'কলের মানুষে' পরিণত হয় বাদল গাঙ্গুলি। উচ্চবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্তের ভয়ানক সংঘাতের ফলে মানুষের মনে কিধরনের বিকারের সৃষ্টি হতে পারে ঔপন্যাসাকি আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার এক প্রতচ্ছবি তুলে ধরলেন এই উপকাহিনি নির্মাণের মধ্যে দিয়ে।

- ***নারী পুরুষের বহুগামিতা ও বিকৃত জৈবিক প্রবৃত্তি:*** নারী পুরুষের ***'বহুগামিতা'***[১৯] সমাজের একটি ভয়াবহ সংকটের দিক। এই বহুগামিতা কখনো হয় যৌনপ্রবৃত্তি বা ***'লিবিডো'***[২০] ভিত্তিক, আবার কখনো মানসিকভাবেও তা হতে পারে। বহুগামিতার অর্থ হল একজন পুরুষ বা নারীর একাধিক অন্য পুরুষ বা নারীর সংসর্গে আসতে চাওয়ার বাসনা। কিন্তু তা আদৌ মানুষকে প্রকৃত সন্তুষ্টি দিতে পারে কী? পারে না। প্রতিনিয়ত আকর্ষণ-বিকর্ষণের জালে জড়িয়ে পরছে মানুষ। প্রায়সই বিকৃত জৈবিক প্রবৃত্তি নিয়ে ঘুরে বেরানো মনুষ্যরূপি পশুর শিকার হচ্ছে আরেকজন মানুষ। পঞ্চতপা উপন্যাসে এই ধরনের যৌনপ্রবৃত্তি ও বিকারের বৃত্ত রচনা করেছেন ঔপন্যাসিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। সেই বৃত্তে রয়েছে তিনটি চরিত্র – ***হোপুন > চাঁদমণি < রণবীর ঘোষ।***

আদিবাসি সমাজের মাঝির ছেলে হোপুন আর পাগল সর্দারের মেয়ে চাঁদমণির মাঝে প্রেমের সম্পর্ক। তাদের বিয়ে হবে বলেও একরকম স্থির রয়েছে। কিন্তু পাগল সর্দার মেয়ের বিয়ে দিতে সঠিক সময়ের অপেক্ষা করছিল। সে তার মেয়ের জৈবিক প্রবৃত্তির কথা বুঝত ভালোভাবেই।

এককালে চাঁদমণির মা ফুলমণিও পাগল সর্দাকে ছেড়ে অন্য পুরুষের হাত ধরে চলে গিয়েছিল। আদিবাসী সমাজে যে পুরুষকে স্ত্রী ছেড়ে যায় তাকে ***‘ছাড়োয়া’***[২১] বলে। এমন পুরুষের তাদের সমাজে বিশেষ সম্মান নেই। কিন্তু পাগল সর্দার নিজের ব্যাক্তিত্বের জোরে সে সম্মান আদায় করে নিতে পারলেও তার শিষ্য ও সন্তানতুল্য হোপুনের জীবনের এমন পরিণতি ঘটুক তা চায়নি। অথচ অবশেষে হল এমনটাই। বিয়ে স্থির হওয়ার পরেই চাঁদমণি হোপুনকে ছেড়ে চলে যায়। প্রথমাবস্থায় বাহাদুর জমাদারকে সন্দেহ হলেও চমক লাগে যখন মড়াইয়ে সিমেন্টের যোগান দেওরার কন্ট্রাক্টর ঘোষ এন চাকলাদার ফার্মের মালিক রণবীর ঘোষের সঙ্গে চাঁদমণির সম্পর্কের কথা জানা যায়। উপন্যাসের প্রথম দিক থেকেই দেখানো হয়েছে এই রণবীর ঘোষের মহিলাদের প্রতি কামুক প্রবৃত্তির চেহারা- ***‘নীল চশমাটা রণবীর ঘোষের হাতে। চেয়ে আছে। চেয়েই ছিল। সান্ত্বনা লক্ষ্য করেনি এতক্ষণ। চাউনি নয়, অজ্ঞাত একটা নগনতার স্পর্শ লাগল ওর চোখে মুখে সর্বাঙ্গে। দৃষ্টি নয়, লেহন’*** [২২]**।** বহু নারীর সর্বনাস করেছে সে। বাইরের চেহারায় দৃশ্যমান হয় যে সে বিত্তশালী সভ্য সমাজের আধুনিক সাজসজ্জায় মোড়া পুরুষ। অথচ তার অন্তর ছিল কলুসিত, বিকারগ্রস্ত। সভ্য সমাজের নারীর প্রতিও তার যেমন কামুকতা আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের সরল নারীর প্রতিও তার সেই একইরকম কামুকতা। স্থান কাল পাত্র ভেদে তার শিকার আলাদা আলাদা। যেখানেই সে সুযোগ পায় সেখানেই সে অবাধ যৌনতায় লিপ্ত হয়। আর চাঁদমণির বহুগামি যৌনপ্রবৃত্তি ছিল খানিক জিনগত। তবে নারী পুরুষের এই বহুগামিতার ফল ভয়ঙ্কর। চাঁদমণির প্রতারণা হোপুন মেনে নিতে পারেনি। সাংঘাতিক প্রতিশোধ নিয়েছে সে চাঁদমণি ও রণবীর ঘোষকে খুন করে। অবশেষে আত্মগ্লানিতে নিজেই নিজের মৃত্যুর পথ খুঁজে নিয়েছে।

বহুগামিতার আরো একটি বৃত্ত রয়েছে এই উপন্যাসে। সেই বৃত্তে রয়েছে আরো তিনজন চরিত্র – ***নরেন চৌধুরী > সান্ত্বনা < বাদল গাঙ্গুলি।*** মড়াইয়ের ইঞ্জিনিয়ার ড্রাফটম্যান নরেন চৌধুরী ও ওভারসিয়ার অবনীবাবুর কন্যা সান্ত্বনার মধ্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠলেও সান্ত্বনা ছিল ভিন্ন গতে বাঁধা। সে আর পাঁচজন মেয়ের থেকে আলাদা। সে মুক্তির প্রতীক। প্রেম, যৌনতা কোনো কিছু দিয়েই তাকে আয়ত্বে আনা যায় না। সে সকলের ভালোবাসার পাত্রী অথচ নিজে না চাইলে সকলেরই নাগালের বাইরে। আশুতোষ রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় পঞ্চতপা উপন্যাস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে অধ্যাপক পবিত্র সরকার সান্ত্বনা চরিত্রটির সঙ্গে ‘রক্তকরবীর’ নন্দিনীর তুলনা করেছেন। সেই তুলনা যথার্থ যৌক্তিক।

বহুগামিতার প্রবৃত্তি শুধু শারিরীক নয় মানসিক সাহচর্য লাভের আশাতেও হতে পারে। চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলি এবং সান্ত্বনার সম্পর্কের মধ্যেও তেমন প্রবৃত্তির আভাস পাওয়া যায়। নীলাকে ভালোবাসা ও তার সাথে বিচ্ছেদের পরেও বাদল গাঙ্গুলি তার ঘরের টেবিলে রূপোর ফ্রেমবন্দী নীলার ছবি রেখে দিয়েছিল। সে তাকে ভুলতে পারেনি। এমতাবস্থাতেও সান্ত্বনার অবস্থানকেও সে উপেক্ষা করতে পারেনি। তাই মনে মনে কিছুর আশা নিয়েই ভাবতে পেরেছিল –***‘এই মেয়েটিকে ওর মা দেখলে ভারি খুশি হত’***[২৩]। আর সান্ত্বনাও বাদল গাঙ্গুলির জীবনে নীলার ফিরে আসাটা মানতে পারেনি। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নীলাকে সে তাড়িয়েছে। মিথ্যা কথাকে অকপটে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে যে বাদল ***‘নীলা হারিয়ে সান্ত্বনা পেয়েছে’***[২৪]**।** বাদলের কাছে নিজেকে ধরা দেওয়ার জন্য দুর্যোগের রাতেও সান্ত্বনা এসেছিল, ***‘এসেছিল সগর্বে নিজেকে প্রকাশ করতে, প্রতিষ্ঠিত করতে। এসেছিল আকর্ষণ করতেও’***[২৫]**।** সুতরাং বাদলের প্রতি সান্ত্বনার প্রচ্ছন্ন প্রেম প্রকট হতেও চেয়েছিল সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। বহুগামীতার এই দুই বৃত্তের কোনো সম্পর্কের পরিণামই সুখকর হয়নি। প্রথম বৃত্তের পরিণাম ঘোষিত হয়েছে ভয়ঙ্কর মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে আর দ্বিতীয় বৃত্তের সমাপ্তি ঘটেছে বিচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে।

- ***মঙ্গলের সাধনা ও সভ্য মানুষের স্বার্থের সংঘাত:*** ‘পঞ্চতপা’ শব্দের অর্থ চারপাশে চারটি অগ্নিকুন্ড ও উর্ধমুখে সূর্য – এই পাঁচ অগ্নির কঠর তপস্যাকারী। বর্ষা শেষ হতে না হতেই মড়াই নদী শুকিয়ে যায়। পাহাড়ের কোলে থাকা আদিবাসী জীবন খরা তাপে জলের অভাবে তেতে ওঠে। সেই দুর্বিসহ জীবনের মঙ্গল সাধনের জন্যই মড়াই এ বাঁধ তৈরির কর্মযজ্ঞ। এই মঙ্গল সাধনার কান্ডারী আপাতদৃষ্টিতে চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙুলিকে মনে হলেও সমগ্র উপন্যাস জুড়ে আসল মঙ্গলের সাধনা করেছে সান্ত্বনা ও আদিবাসী সমাজ। কোনো একসময় অনেক ছোট অবস্থায় সান্ত্বনার পরিবারের বাস ছিল মড়াই নদীর উপত্যকায়। তখনই সে দেখেছে তার মা ঠাকুমার জলের জন্য দুর্বিসহ পীড়াকে। জলের জন্য বিকারগ্রস্ত হয়ে যাওয়া মাকে হারিয়েছে, ঠাকুমাকে দেখেছে সূর্যের দিকে ঠায় তাকিয়ে থেকে বৃষ্টির কামনা করতে। মানুষের অভাবনীয় দুঃখ দুর্দশার সাক্ষী থেকেছে সে। তারপর একসময় প্রাণের দায়েই সেই স্থান ত্যাগ করে বাবার হাত ধরে তাকে ঘরছাড়া হতে হয়। তাই যখন থেকে সে জানতে পেরেছে মড়াইয়ে বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা সম্পর্কে তখন থেকেই তার কৌতুহলের শেষ নেই। প্রেম ভালোবসা বিয়ে বন্ধুত্ব আত্মিয়তা সবকিছুর উর্ধে তার কাছে মড়াইয়ের বাঁধ নির্মাণের খবর। অথচ সান্ত্বনা পড়াশোনা জানে না, মড়াইয়ের কর্মযজ্ঞে তার প্রত্যক্ষ কোনো কাজ নেই। তবুও সে মড়াইয়ে কর্মরত বাবার সাথে বরাবরের মতো মড়াইয়ের দেশে চলে যায়। ইট কংক্রিট, সিমেন্ট, ক্রেন, পাথর ডিনামাইটের রাজ্যে সে স্বতেজতা

বয়ে নিয়ে যায়। শুধুই তার কৌতুহল এই নিয়ে যে মড়াইয়ের ড্যাম কবে হবে? কীভাবে হবে? অথচ এই ড্যাম হলে তার ব্যক্তিগত কোনো উপকার নেই। তবুও এই ড্যাম তৈরি নিয়ে তার একবুক আশা৷ প্রতিদিন সে মড়াই এর উপত্যকায় পাহাড়ের গা বেয়ে ঘুরে বেড়ায় আর এই বিপুল কর্মযজ্ঞের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবরাখবর রাখে। এইটিই তার নিঃস্বার্থ ধ্যান জ্ঞান সাধনা। আর এই সাধনায় যোগ দিয়েছিল ভালো মন্দের জ্ঞানহীন অশিক্ষিত কৃষ্ণকায় নিরুপায় আদিবাসীরা। কিন্তু এই সাধনার মাঝেই স্বার্থের সংঘাত ঘটে।

সান্ত্বনা প্রথমাবস্থায় পঞ্চতপা হিসাবে চিহ্নিত করেছিল চিহ্নিত করেছিল ইঞ্জিনিয়ার ড্রাফটম্যান নরেন চৌধুরী, চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলী, আদিবাসী পাগল সর্দার এবং আদিবাসীদের –***‘ এই দেখ মুর্তিমান পঞ্চতপা। ... মাথার ওপর তাপ, চারদি কে পৃথিবীর তাপ –এই পাঁচ তাপের মধ্যে বসে –এই! ... এঁদের চিফ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে পাগল সর্দার পর্যন্ত সববাই তাই’***[২৬]। কিন্তু এই ভুল ভেঙে যায় যখন জানা যায় চিফ ইঞ্জিনিয়ার বাদল গাঙ্গুলির কর্মবিহ্বলতার কারণ নিঃস্বার্থ মঙ্গলের সাধনা নয় নিজেকে নির্ভেজাল ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে প্রমাণ করা। স্বান্ত্বনা আসলে ভেবেছিল বাদল আর তার সাধনার বস্তু এক –মড়াইয়ের বাঁধ তৈরি করে মানুষের দুঃখ দুর্দশা দূর করা। এই চেতনা থেকেই তার মনে বাদলের প্রতি শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের সঞ্চার। কিন্তু যখন সে বুঝতে পারল যে তার ধারণা ভুল তখন সে শেষ চেষ্টা করেছিল যাতে অন্য কোনো চোখ ধাঁধানো মোহে বাদলের এই কর্মসাধনা ভঙ্গ না হয়। নীলাকে তাড়িয়ে নিজের প্রতি আকর্ষণে বেঁধে সে বাদলের কর্ম সাধনার মোহ বজায় রাখতে চেয়েছিল। নীলাকে তাড়ানোর কৈফিয়তে সে কথা সে স্বীকারও করেছে -***‘কারণ, আপনার কাজের থেকেও নীলা আপনাকেই বড় করে দেখে তাই। কারণ, নীলা আবারও পারে আপনার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে তাই। কারণ, আপনার পুরুষকারের ওপর আমার বিশ্বাস নেই তাই। কারণ, আপনার ওই শোক-মোহ ভেঙে গেলে এই কাজের মোহও ভেঙে যেতে পারে তাই’*** [২৭]। কিন্তু সংঘাতের শেষে সে সংযত চিত্তে হেঁটেছে বিচ্ছেদের পথে, একা৷ শেষ পর্যন্ত এই মড়াইয়ের কর্মযজ্ঞে আহুতির মতো চলে গিয়েছে সান্ত্বনার প্রাণও। এত সংঘাত ও সাধনার শেষের ফলটুকু পঞ্চতপা সান্ত্বনা দেখে যেতে পারেনি। কিন্তু উপন্যাসের শেষভাগে ঔপন্যাসিক এত সংঘাত ও সাধনার ফলকে মঙ্গলালোকেই রেখেছেন, ‘মড়াই নদীর ড্যাম হয়েছে’। আর তার সঙ্গে সূচনা হয়েছে নগরায়নের।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস লেখার প্রারম্ভ পর্যায়ের উপন্যাসগুলির কাহিনি বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় নানাবিধ বিষয়। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে উপন্যাসগুলির বিষয়ে গতানুগতিক জীবনের কোনো যাপনচিত্র নেই। ‘পঞ্চতপা’ উপন্যাসের বিষয়গুলি বিস্তার লাভ করেছে পাহাড়ের কোল দিয়ে বয়ে যাওয়া শুকনো মড়াই নদীতে বাঁধ দেওয়ার কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করে। সেখানে রয়েছে এক অ্যাডভেঞ্চারের জগৎ, আদিবাসী জীবনের নানা তথ্য এবং তথাকথিত নগরকেন্দ্রিক সভ্য সমাজের সঙ্গে আদি মানুষদের দলিত জীবনের সহাবস্থানের চিত্র।

তথ্যসূত্র :

১। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-২, পঞ্চতপা উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি-৭৩, পৃ.১৮।

২। তদেব।

৩। তদেব। পৃ.১৯।

৪। তদেব।

৫। তদেব।

৬। তদেব। পৃ. ১০৪।

৭। তদেব। পৃ.৯৩।

৮। তদেব।পৃ. ৯৫।

৯। তদেব। পৃ.৯৬।

১০। তদেব। পৃ.৩।

১১।https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A7%E0%A7%81_%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A8%E0%A7%81

১২। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-২, পঞ্চতপা উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি-৭৩, পৃ.৩।

১৩। তদেব। পৃ.৪৩।

১৪। তদেব। পৃ.১৯১।

১৫। তদেব। পৃ.১৯৩।

১৬। অতনু শাশমল,বাংলা উপন্যাস ও গল্পে নগর-জীবন ১৮২৫-১৯১৩ খিস্টাব্দ, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা-৯, পৃ.১৯।

১৭। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-২, পঞ্চতপা উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি-৭৩, পৃ.১২১।

১৮। তদেব। পৃ.১১৬।

১৯।https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%AC%E0%A6%B9%E0%A7%81%E0%A6%97%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%BF%E0%A6%A4%E0%A6%BE_(%E0%A6%85%E0%A6%AC%E0%A7%88%E0%A6%AC%E0%A6%BE%E0%A6%B9%E0%A6%BF%E0%A6%95_%E0%A6%B8%E0%A6%AE%E0%A7%8D%E0%A6%AA%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%95)

২০।https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%8B

২১। আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায় রচনাবলী-২, পঞ্চতপা উপন্যাস, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কলি-৭৩, পৃ.২১।

২২। তদেব। পৃ.৭৩।

২৩। তদেব। পৃ.১৯৫।

২৪। তদেব। পৃ.২২১।

২৫। তদেব। পৃ.২৩০।

২৬। তদেব। পৃ.৫৩।

২৭। তদেব। পৃ.২৩১।

আন্তর্জাতিক অন্তর্জাল মাধ্যম:

১। https://roar.media/bangla/main/art-culture/santal-people-and-their-culture

২।http://onushilon.org/geography/bangladesh/khudro-nrigosthi/santal/santali.htm

৩।https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A1%E0%A7%8B

সহায়ক গ্রন্থ :

১। অতনু শাশমল, বাংলা উপন্যাস ও গল্পে নগর-জীবন ১৮২৫-১৯১৩ খিস্টাব্দ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা-৯।

২। দেবেশ রায়, দলিত, সাহিত্য আকাদেমি, চতুর্থ মূদ্রণ-২০১৫, কলকাতা।

৩। হেমলতা কেরকেটা, বাংলা উপন্যাসে আদিবাসী জীবন, প্রথম সংস্করণ, মার্চ ২০২০, কলকাতা-৯।

৪। মৃন্ময় প্রামাণিক, দলিত সাহিত্য চর্চা, গাঙচিল, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা-৭।

৫। জয়দেব বেরা, দলিত, নায়রা বুকস, প্রথম সংস্করণ:ডিসেম্বর ২০২০, বাঁকুড়া-৭২২১৫৭।

৬। শরণকুমার লিম্বালে, দলিত নন্দনতত্ত্ব, অনুবাদ-মৃণ্ময় প্রামাণিক,তৃতীয় পরিসর।

৭। সুবোধ দেবসেন, বাংলা কথাসাহিত্যে ব্রাত্যসমাজ, পুস্তক বিপণি।